*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.47-64. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

নদীয়া জেলার বারোদোল মেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বর্তমান

ডঃ অখিল সরকার
ইতিহাস বিভাগ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
Email: akhil@nvc.ac.in

সারসংক্ষেপ-

নদীয়া জেলার তথা ভূভারতের মধ্যে ব্যতিক্রমী মেলা হিসেবে বিগত কয়েক শতাব্দী সময়ব্যাপী বারোদোলের মেলা কৃষ্ণনাগরিকবৃন্দের কাছে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আবেগকে কেন্দ্র করে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে চলেছে। একদা এই সুপ্রসিদ্ধ বারোদোলের মেলা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং একক পরিবার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান হিসেবে সূত্রপাত হলেও কালচক্রের অভিঘাতে এই উৎসব সার্বজনীন সত্তার ও ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বারোদোলের মেলা মানেই বারোঠাকুরের দোলের খেলা এবং দেবতা ও ভক্তকুলের মিলনোৎসব। সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের উর্দ্ধে এই বারোদোলের মেলা আসলে ছিল বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় সৃষ্ট শাক্ত শাসকের প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় অপার এক আনন্দধারা। তবে একমাত্র মহামারী কিংবা অতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যাতিত এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সামনে দীর্ঘকালীন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে নি। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে নদীয়া জেলার বারোদোল মেলার বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করার প্রচেষ্টা থাকবে।

সূচক শব্দ: – *আবেগ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, আনন্দ-উৎসব, আধ্যাত্মিকতা, পৃষ্ঠপোষকতা, ঐতিহ্যমন্ডিত*

নদীকেন্দ্রিক বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ঐশ্বর্যময় প্রসিদ্ধি ছিল নদীয়ার সুপ্রশস্ত জনপদের। সুপ্রাচীন নদীয়ার প্রশাসনিক রাজধানী কৃষ্ণনগর[1] অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কাল থেকেই গুরুত্ব বিশেষ করে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মেলার[2] আক্ষরিক অর্থ মিলন বা যোগসূত্র, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়, সাক্ষাৎ দর্শন এবং মানবিক সংযোগ সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে মেলা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সুপ্রাচীন পর্যায়কাল থেকেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দেব-দেবীর মঠ-মন্দির কিংবা বৈচিত্রময় ঋতুতে অনুষ্ঠিত আনন্দ উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার সূত্রপাত। এই সমস্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে এবং মেলার জাঁকজমক পরিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদান-প্রদানের এবং ভাববিনিময়ের এক নিবির সংযোগ গড়ে ওঠে। কৃষ্ণনগরের বারোদোলের উৎসব বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেলা হিসেবে পরিচিত। নদীয়ার শাসক কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে এই মেলার সূত্রপাত হয়েছিল বলে জনমুখে কথিত আছে। অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ এই মেলা একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান হিসাবে সূত্রপাত হলেও সময়ের কালচক্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুগ্ম সত্তার আত্তীকরণ এবং ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুচতুর চূড়ামণি রসিকপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ ও মেলার প্রবর্তন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সেক্ষেত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে এই বারোদোল মেলার সূত্রপাত হয়েছিল। এই বারোদোলের মেলা কৃষ্ণনগর ব্যতীত বাংলা তথা ভূ-ভারতের অন্য কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় না। সেই কারণে এই মেলার সঙ্গে কৃষ্ণনাগরিক তথা নদীয়ার জনগণের মধ্যে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ভীষণ রকম আবেগ এবং উন্মাদনা জড়িয়ে রয়েছে। তাই এই অঞ্চলের সর্ব সাধারন মানুষ সারাবছর গভীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন বারোদোলের মেলার জন্য। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার পর চৈত্রের শুক্লা একাদশী তিথিতে নদীয়ার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজবাড়ীর চকের মাঠে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বারোদোলের উৎসব। (মল্লিক, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৩৬৭) জে.এইচ.ই.গ্যারেট তাঁর Bengal District Gazetteers-এ মন্তব্য করেছেন "The great Hindu Swinging festival (Baradol) is celebrated in Krishnagar annually in March or April, when 12 idols, belonging to the Maharaja of Krishnagar and representing Sri Krishna in twelve different presentations, are brought together to the Rajbari from different parts of the district and worshipped. Some 20,000 pilgrimages assemble every year for this festival, and a fair lasting for three days is held simultaneously." (Garret, 1910, p-175)

কৃষ্ণনগরের জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র জগদ্ধাত্রী পুজো বা মৃৎশিল্প কিংবা সরভাজার জন্যই নয়। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বারোদোলের মেলারও দিগন্ত বিস্তৃত গরিমার জন্যও সুপরিচিত। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর সংলগ্ন সুবিশাল প্রাঙ্গনকে কেন্দ্র করেই লুকিয়ে রয়েছে বহু বলা এবং না বলা কল্প কাহিনী, ইতিহাস এবং লৌকিক-অলৌকিক ঘটনা প্রবাহ। বারোদোল মেলার মুখ্য আকর্ষণ হচ্ছে অঞ্জনা নদী বা খাল [3] (হ্রদ) দ্বারা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের বারোদোল। মেলায় প্রবেশ করবার জন্য একটি মুখ্য প্রবেশদ্বার ছাড়াও মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য রাজপ্রাসাদের পশ্চিমদিকে একটি ছোট্ট প্রবেশপথ রয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে দর্শনার্থীদের খুব সহজেই মেলাকে উপভোগ করবার জন্য এবং মেলায় যেহেতু এইসময় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়ে থাকে সেই কারণে মেলা কমিটির সৌজন্যে মেলা প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে চৌধুরীপাড়ার মূল রাস্তার সঙ্গে মেলার সংযোগ সাধনের জন্য শুধুমাত্র মেলার কিছুদিন একটি সাময়িক কাঠের পাটাতনের সেতু নির্মাণ করা হয়। আগেকার দিনে বারোদোলের মেলার বিষয়টাই ছিল বিচিত্র রকমের। বিভিন্নপ্রান্তের গ্রাম-গঞ্জ থেকে মেলার আকর্ষণে ছুটে আসতেন মানুষেরা। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব বেশি উন্নত না থাকার দরুন গ্রামের মানুষজন মেলায় আসতেন পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। মেলা দেখার শেষে অধিকাংশরাই বাড়ি ফিরতেন না। তারা মেলায় থেকেই যেতেন। ভোরের আলো ফুটতেই রওনা দিতেন সকলে মিলে বাড়ির দিকে। ফলে মেলায় সারারাত ধরেই লোক থাকতো। পরবর্তী সময়ে সাইকেল-রিক্সার সাহায্যে মেলা উপভোগ করার রেওয়াজ চালু হয়। কিন্তু বর্তমানে রিক্সার জায়গায় দখল করে নিয়েছে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ব্যাটারি চালিত টোটো।

কৃষ্ণনগরের এই বিগ্রহের উপাসনার নামকরণ বারোদোল হল কেন তা নিয়ে গবেষক ও ঐতিহাসিকরা পৃথক্ পৃথক্ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এই উৎসব যেহেতু মূল রাজবাড়ির বাইরে অনুষ্ঠিত হয় তাই এর নামকরণ বাহিরদোল বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন কিছু পণ্ডিত। আবার কারো কারো মতে বারোজন দেবতার বিগ্রহকে কেন্দ্র করে এই উৎসব তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেকারণে নামকরণ বারোদোল। গরুর পুরাণে এই বিষয়ে উল্লেখিত আছে যে,

কলিকালে চৈত্রশুক্লা পক্ষে দক্ষিণামূখ করে জনার্দ্ধনকে পূজো করে দীর্ঘ একমাস ব্যাপি দোলনে দোলাতে হয়। (মিত্র, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা-২৩৮) কৃষ্ণনাগরিকদের আস্থা এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রায় সিংহভাগ মানুষ বিশ্বাস করে থাকেন এই ঐতিহ্যমন্ডিত বারোদোল মেলার সূত্রপাত করেছিলেন নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।[4] কিন্তু ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বীরোচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য থাকলেও বারোদোল সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য অভিমত উপস্থাপনা করেন নি, আবার নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্রের (১৮১৯-১৮৫৭) আমলে তাঁর দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) দ্বারা রচিত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত গ্রন্থে কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য প্রগাঢ় পন্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্বচরিতম সেখানেও কৃষ্ণনগরের বারোদোল মেলা প্রসঙ্গে কোন লিখিত তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না।[5] অর্থাৎ কৃষ্ণনগর বারোদোল মেলার সৃষ্টির রহস্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার ধোঁয়াশার জন্ম হয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির একজন ধারক ও বাহক। তাঁর পক্ষে এইরকম একটি মেলার প্রচলন করা অস্বাভিক কিছু ছিল না। তিনি শাক্ত ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও হিন্দু ধর্মের রক্ষা ও প্রচারের জন্য বৈষ্ণবীয় অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যেমন আড়ংঘাটায় তাঁর প্রত্যক্ষ মদতে নির্মিত হয়েছিল যুগলকিশোর মন্দির (১৭২৮), গঙ্গাবাসে হরিহর মন্দির (১৭৭৬), কথিত আছে কৃষ্ণচন্দ্র হরিহর মন্দিরে চিত্রকূট পর্বত থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন বিশিষ্ট একখন্ড প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ধারণা করা হয়ে থাকে একসময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মন্দির কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালের সময় দাঁড়িয়ে বারোদোল মেলা উদ্ভবের সংজ্ঞাবাচক চিত্রণ বর্ণনা করা প্রায় দুরূহ। সেই কারণে কৃষ্ণনগরের বারোদোলের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষৎতের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম পরিব্যপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত হয়েই থাকবে বলে আমার ধারণা। রঙদোলের রঙিন উৎসবের পর একমাত্র কৃষ্ণনগরে অভূতপূর্ব এবং স্বতন্ত্র বারোদোলের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গোপালভট্ট গোস্বামী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ আছে-

চৈত্র সিতৈকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখ্যং প্রভূম।
দোলয়া দোলনং কুর্যান্নীতনৃত্যাদিনোৎসবম্।।
তথা চ গরুড়ে-
চৈত্র মাসি সাইট পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্।
দোলারুঢ়ং সমভ্যর্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ।।
(মল্লিক, *নদীয়া-কাহিনী*, (রায়, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৩৬৭)

উক্ত কারণে, কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা সংস্থাপিত চৈত্র মাসে রাধা কৃষ্ণের দোল শাস্ত্রানুগ, শাস্ত্রবিরোধী নয়। মান্যহরিদাস দাস অভিব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণনগরের রাজবংশ পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব বিদ্বেষী বলে কথিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে শ্রী গৌড় মূর্তিকে ছয়মাস যাবত মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখা হয়েছিল।[6] স্মৃতি অনুগত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৈতন্য অবতার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এমনকি ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতে উল্লেখিত হয়েছে, যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চৈতন্য উপাসকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। সে কারণে একথা অনুমান করতে প্রলুব্ধ হয় যে, প্রগাঢ় শাস্ত্রবিদ কৃষ্ণচন্দ্র রায় যেরূপ নবদ্বীপের বৈষ্ণব ধর্মের পবিত্র ভূমিতে বৈষ্ণবীয় রাসলীলা উৎসবের মধ্যে শাক্ত রাসের প্রচলন ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন,

এইরূপ হয়তো বা শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার উৎসবের বিকল্প হিসাবে পরবর্তী সময় বারোদোল মেলার সূচনা করেছিলেন। জনশ্রুতি মতে কৃষ্ণচন্দ্র রায় তার ছোট রানী অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে উলা (বীরনগর)[7] গ্রামে জাতের মেলা বা বৈশাখ পূর্ণিমায় উলাইচন্ডির পূজো দেবেন বলে রাজার নিকট আবদার করেছিলেন।(চক্রবর্তী, কলকাতা ২০২১, পৃষ্ঠা-২০৬) উল্লিখিত সময় উলা বা উলোর জাতের মেলা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই মেলাই দেখতে চেয়েছিলেন লক্ষ্মী দেবী। কিন্তু কর্মব্যস্ততার জন্য এবং রাজ কর্মের প্রতি অত্যাধিক মনোযোগী হেতু তিনি স্ত্রীর আবদার পূরণ করতে পারেননি। ফলে ছোট রানী সাংঘাতিক অভিমানী হয়েছিলেন, রানীর সেই অভিমান দূর করবার জন্য এবং আত্ম সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত পাত্র মিত্রের পরামর্শ ক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর রাজসভার প্রগাঢ় পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সহ বিশিষ্ট পণ্ডিতদের পরামর্শক্রমে চৈত্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে রাজবাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে আস্ত এক মেলা বসিয়েছে ফেলেছিলেন। অন্য আরেকটি মতানুসারে নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্র রায় (১৮০২-৪১) বারোদোলের প্রবর্তক ছিলেন, তিনিও নাকি রাজমহিষীর অনুরোধক্রমে এই মেলার সূত্রপাত করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থে বারোদোল উৎসব মেলা হিসেবে মহিমান্বিত হলেও এর মূলে রয়েছে বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় কৃষ্ণ বা গোপালের আরাধনা। অর্থাৎ শাক্ত ধর্মের রক্ষাকর্তার প্রচ্ছন্ন মদতে বৈষ্ণবীয় রীতি নীতি মেনেই নদীয়াতে সূত্রপাত হয়েছিল বিরল এবং অসাধারণ এই বারোদোলের মেলার। (সরকার, ২০১৯, পৃষ্ঠা-৫৪৫)

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগর ছিল বাঙালির চিন্তনের মননের আধ্যাত্মিকতার এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির হৃদপিণ্ড, তথা সমগ্র বঙ্গের পথপ্রদর্শক। উক্ত কালে নবদ্বীপের শাস্ত্রীয় বিধান মানেই সমগ্র বঙ্গের বিধান হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। নদীয়া রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁর শাসনকালে রাজবংশের সুখ্যাতি, অর্থ-যশ এবং প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তেমনই দুর্যোগের কোন অন্ত ছিল না, কারণ একদিকে মোগল সাম্রাজ্যের রুগ্নদশা এবং তার পরিণাম হিসাবে মহারাষ্ট্রীয় শক্তির আগ্রাসনের ফলে বাংলার রাজনীতিতে অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। উক্ত সময়ে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ থেকে বাঁচতে সুরক্ষিত জায়গায় রাজধানী স্থাপনের জন্য কৃষ্ণনগর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে দুর্গের ন্যায়, ইন্দ্রপুরীর মতো নগর নির্মাণ করেছিলেন। (রায়, ২০০৮, পৃষ্ঠা -৭৬) অন্যদিকে তাঁর রাজত্বকালে পলাশীর ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয়েছিল এবং অস্তমিত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতার সূর্য। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৭২৮ থেকে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছিল বহুবার। ফলে একদিকে যেমন রাজ্যের উপর দুর্যোগের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তেমনি প্রাণনাশের সংশয় দেখা দিয়েছিল তাঁর। কিন্তু সুচতুর, নির্ভীক এবং প্রত্যুৎপন্নমতি রাজা তার ক্ষুরধার ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধি বলে সমস্ত রকম বিপদ থেকে মুক্ত হয়, প্রাণ এবং রাজ্য দুটোই রক্ষা করেছিলেন। চতুর্দিকে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসতো কৃষ্ণচন্দ্র তখন পাত্র-মিত্র সভাসদদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে কাল যাপন করতে ব্যস্ত থাকতেন। এই রূপ নির্ভিক রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। (রায়, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৭৪) নদীয়ার রাজবংশের কুলবিগ্রহ হলেন বড় নারায়ণ। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পঞ্চ অলংকৃত ঠাকুর দালানের দক্ষিণ দিকে সুবিশাল নাটমন্দির বা চাঁদনি। এই নাটমন্দিরের খিলান গুলির পাদপীঠের উপর নদীয়ারাজ্ প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কৃষ্ণ বিগ্রহ বারোদোলের প্রথম তিন দিন পৃথক কাঠের সিংহাসনে মঞ্চ নির্মাণ করে পুজো করা হয়ে থাকে। বারোটি বিগ্রহের দোল সেজন্যই নামকরণ করা হয়েছে বারোদোল। দৃশ্যপট অতীব অপূর্ব। বারোদোলে রাজবংশের কূল বিগ্রহের সঙ্গে আরও বারোটি কৃষ্ণ বিগ্রহ পাশাপাশি অবস্থান করেন অর্থাৎ সর্বমোট তেরটি বিগ্রহ থাকলেও মেলার নামকরণ করা হয়েছে বারোদোল। একদা মহাসমারোহে বারোদোলের জন্য বারোটি বিদ্রোহকে বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হতো। উৎসবের সময় তিনদিনব্যাপী মন্দিরের বিগ্রহ গুলো পূজিত হয়ে থাকেন। দীর্ঘ এক মাস অতিবাহিত

হবার পর পুনরায় বিগ্রহ গুলোকে যথাস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে। এই উৎসবের বিগ্রহ গুলো হল বলরাম, শ্রীগোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোট নারায়ণ, ব্রহ্মণ্যদেব, গড়ের গোপাল (শান্তিপুরের অদূরে সুত্রাগড়ে), অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, নদীয়ার গোপাল, তেহট্টের কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দদেব এবং মদন গোপাল। নদীয়ার রাজবংশ দ্বারা প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর সারা বছর এই সমস্ত বিগ্রহগুলোর পূজা অর্চনা করা হয়ে থাকে। তিনদিন দিনব্যাপী এই বারোদোলের উৎসবে বিগ্রহগুলো তিন রকমের সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হয়ে থাকে। প্রথম দিন অর্থাৎ মূল্যবান স্বর্ণাদি অলংকারে সজ্জিত রাজবেশ, দ্বিতীয় দিন সুগন্ধযুক্ত পুস্পমাল্যে সজ্জিত ফুলবেশ এবং তৃতীয়দিন দরিদ্র রাখাল সাজে সজ্জিত রাখালবেশ।(মল্লিক, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা -৩৬৯) কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত লিখেছেন-

বিরহীর বলরাম শ্রীগোপীমোহন।
লক্ষীকান্ত বহিরগাছি গুরুর ভবন।।
নারায়ণচন্দ্র ছোট ব্রহ্মন্যদেব সহ।
আর বড় নারায়ণ রাজার বিগ্রহ।।
গড়ের গোপাল পেয়ে স্থান শান্তিপুর।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ স্থানে ঘোষঠাকুর।।
নদীয়ার গোপাল তবে নবদ্বীপে স্থান।
ত্রিহট্টের কৃষ্ণরায় -আগে ফল পান।।
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দের আর।
উভয় বিগ্রহ স্থান আবাস রাজার।।
মদনগোপাল শেষে বিরহীতে স্থিতি।
বারদোলের তের দেব আবির্ভূত ইতি।।
হেরিলে দেবেরে হরে আধি-ব্যাধি-ক্লেশ,
রাজবেশ ফুলবেশ রাখালের বেশ।।
ভক্তিভরে দেবনাম করিলে কীর্তন।
সকল পাতক নাশে শান্তি লভে মন।।
ইতি চৈত্র শুক্লপক্ষে শ্রীমন নদীয়াধীপস্য।
প্রাসাদোদ্যানে বারদোলাবিভূতনাং দেব বিগ্রহানাং।। (মল্লিক, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা -৩৬৯)

বারোদোলের উৎসব তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত হলেও সর্বসাধারণের আবেগ এবং উচ্ছাসকে মর্যাদাজ্ঞাপনের নিমিত্তে মেলার আয়োজকরা পরবর্তী সময় এই মেলার পরিধিকে বাড়িয়েছেন। বর্তমানে এই মেলা প্রায় এক মাস ধরে চলতে থাকে। বারোদোলের মেলার প্রধান আকর্ষণ অগ্রদ্বীপের গোপিনাথের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে। কারণ বৈষ্ণবতীর্থ অগ্রদ্বীপের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং আবেগ জনমুখে বহুল প্রচলিত। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথেরর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন নদীয়ার রাজা রাজেন্দ্রবাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র রায়। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত প্রায় দুই ফুট উঁচু কষ্টি পাথরের গোপীনাথের মূর্তির সঙ্গে রয়েছে অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত মূল্যবান রাধিকার মূর্তি। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতে উল্লেখ আছে বাংলার বারোভুঁইয়া দমন কালে রাজা মানসিংহ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শন করেছিলেন এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি

দান করেছিলেন। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ সম্পর্কে উইলিয়াম ওয়ার্ড উল্লেখ করেছেন- One night a stranger came to the temple (Agrodeep Gopinath Temple) at a very later hour, when no one was awake to give him refreshment. The god himself however in the form of Ghosh Thakur took an ornament from his ankle and purchased some food for the stranger at an adjoining. In the morning, there was a great noise in the town about this ornament, When the shopkeeper and the stinger declared these facts, as creditable to the benevolent of the God, and from these circumstances the fame of Gopinath spread still wider... A view of the History Literature and Religion of the Hindoos. (Ward, 1815, p-162) তিনি আরো লিখেছেন At Ugra- deepa the temple of Goopinath has different houses attached to it; one for cooking another for utensils used in worship; another is a store house for the offering and two others are open rooms for the accommodation of visitors and devotees". (Ward, 1815, p-23

গোপীনাথ (পেটের গোপীনাথ, রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১৮২৮ সালে সংঘটিত এক অতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ বিধ্বংসী বন্যা এবং ভাগীরথী নদীর বাঁক পরিবর্তনের কারণে কৃষ্ণচন্দ্র রায় দ্বারা নির্মিত গোপীনাথ মন্দির নদীবক্ষে বিলীন হয়ে যায়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, 2019) পরবর্তী সময়ে পুনরায় মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কষ্টিপাথর এবং অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্মিত মধ্যযুগের দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ বারোদোল উৎসবে আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং কত বছর এই অচল অবস্থা থাকবে তা বলা মুশকিল। উক্ত স্থানে দ্বাদশতম সিংহাসনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পটের গোপীনাথকে। যদিও রাজপরিবারের উত্তরসূরীদের চেষ্টার কোন খামতি নেই তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গোপীনাথকে বারোদোল উৎসবের দিনগুলোতে ফিরিয়ে

আনার জন্য। এমনকি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সদাজাগ্রত গোপীনাথকে ফেরাতে মেলায় তৈরি করা হয়েছিল নাগরিক মঞ্চ। (সরকার ২০১৯, পৃষ্ঠা-৫৪৬) কিন্তু তাকে ফেরানো যায় নি।

মদন গোপাল (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

নাড়ু গোপাল (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

গোষ্টো বিহারী (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

গড়ের গোপাল (শান্তিপুর, সূত্রাগড়) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর বারোদোলে মেলায় পূজিত দেব বিগ্রহ

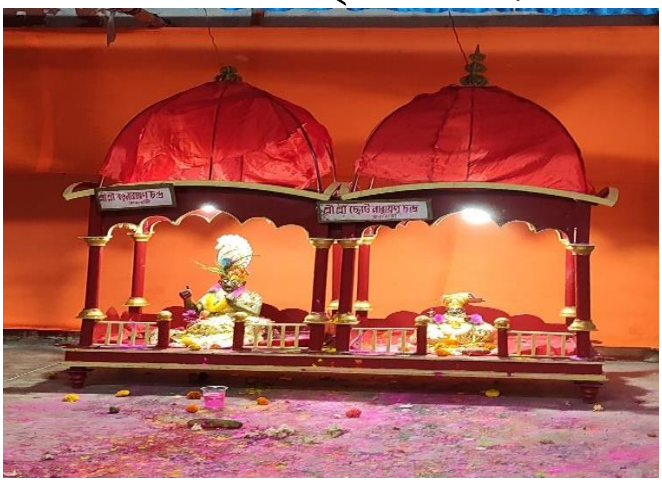

*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.47-64. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

বড়নারায়ণ চন্দ্র ও ছোট নারায়ণচন্দ্র (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, এপ্রিল ২০২৩

বলরাম (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

কৃষ্ণচন্দ্র ও লক্ষ্মীকান্ত (তেহট্ট) তথ্য সংগ্রহ, এপ্রিল ২০২৩

গোপীমোহন (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর বারোদোলে মেলায় পূজিত দেব বিগ্রহ

গোবিন্দদেব (রাজবাড়ী)তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

নদের গোপাল (রাজবাড়ী) তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩

বহু মানুষ পুণ্য অর্জনের জন্য বারোদোলের বিগ্রহের পায়ে রংবেরঙের আবির এবং ফুল-ফলাদি অর্পণ করে থাকেন। এই উৎসবের প্রধান তিনদিন রাজবাড়ীর একটি অংশ ভক্তকুলের জন্য তথা সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়। এই ঐতিহ্যমন্ডিত, স্বতন্ত্র এবং সুপ্রাচীন বাংলার মেলা সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে অজানা বহু-রাজকাহিনী। রাজপ্রাসাদের তোরণের পাশে অসংখ্য ভিক্ষাজীবী এবং সন্ন্যাসীদের আগমন ঘটে। এই রাজদ্বারের বিভিন্ন বয়সী অনুগ্রহপ্রার্থী সন্ন্যাসীরা নানান দেব-দেবীর মূর্তি সহযোগে পসরা সাজিয়ে বসে থাকেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাল-ডাল এবং অর্থের আশায় আগমন ঘটে এই সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের। গেরুয়া বসন ধারী এই সমস্ত সাধক সাধিকা

দের সঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জানতে পেরেছি যে, এই সমস্ত অনুগ্রহ সন্ন্যাসীরা, ভক্তদের কাছ থেকে সেবা গ্রহনের মাধ্যমে জীবন যাপন করেন অর্থাৎ তারা জীবনকে সঁপে দিয়েছেন ঈশ্বরের চরণতলে। তারা সাধারণত ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেলা পরিভ্রমণ করে বেড়ান। এক সময়ে এই সমস্ত ভিক্ষাজীবী সাধক সাধিকাদের মেলায় আগমন ঘটলেও পূর্ববর্তী অল্পসংখ্যক বছর যাবৎ এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। এই রূপ বারোদোলের মেলায় আগত কিছু সাধু সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে জানতে পেরেছি, দিলীপ সাধুখাঁ, নৃপেন মিত্র এবং জয়দেব গোসাই তারা এই মেলাতে এসেছেন গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রম থেকে (চব্বিশ পরগনা জেলা) এনারা বিগত দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ কাল ব্যাপী এই মেলায় আসছেন, এই মেলার বহু উত্থান এবং পরিবর্তনের সাক্ষী তাঁরা। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের ধারণা এই মেলায় আগমনের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ তথা পুণ্যফল। কিন্তু মেলার প্রাঙ্গণে এই সমস্ত পরিযায়ী সাধুসন্তদের নিশিযাপনের কোন সুব্যবস্থার আয়োজন মেলা উদ্যোক্তাদের দ্বারা করা হয় না। ঝড়, রৌদ্র কিংবা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কোন অদৃশ্য পুণ্যের আশায় বারোদোলে মেলা শুরুর প্রাক্কালে হাসিমুখে পরিযায়ী পাখির মত অমৃতের সন্ধানে তাদের আগমন ঘটে এই উৎসবে। ভক্তরাও তাদের নিরাশ করেন না কারণ দান করেন মুক্তহস্তে। ঋকবেদে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি দুঃস্থদের সাহায্য করে না; অজ্ঞানী এবং অন্তর্দৃষ্টিহীনতার সকল উন্নতিই বৃথা, সকল সম্পত্তিই অনর্থক। যে অন্যদের সাহায্য করেনা, অভুক্ত রেখে কেবল নিজে খায় সে মূলত পাপই ভজন করেন। (*ঋগ্বেদ,* ১০. ১১৭. ৬) দান সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় উল্লেখ আছে দান করা কর্তব্য মনে করে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা পূর্বক প্রত্যুৎপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাকে স্বত্তিক দান বলা হয়। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ১৭. ২০) প্রত্যুপকারের আশায় স্বর্গদি ফলাকাঙ্খায় যে দান করা হয় সেই দান রাজসিক দান নামেও কথিত। (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ১৭. ২১) অর্থাৎ দানের মাধ্যমে দাতা যেমন দীর্ঘায়ু লাভ করেন আবার মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু বারোদোলের মেলায় এই সন্ন্যাসীদের প্রদেয় ভক্তদের দানের সামগ্রী বেশ স্বতন্ত্র। চাল-ডাল প্রদান করা হয়ে থাকে নির্দিষ্ট অনুপাতে অর্থাৎ যদি দুকেজি চাল হয় তাহলে এক কেজি ডালের সংমিশ্রণ সহযোগে ভক্তদের প্রদান করার রীতি দীর্ঘদিন যাবত ভক্তরা পালন করে চলেন, এই স্বতন্ত্র দানের মাধ্যমে অধিক পুণ্য অর্জিত হয় বলে বারদোলে আগত ভক্তদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি।

বারোদোল মেলার প্রথম তিনদিনের চিত্র, তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩ ,কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কিন্তু এই মেলায় ঠিক কবে থেকে এই সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের মেলা প্রাঙ্গণে আগমন ঘটেছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা খুব মুশকিল। কিন্তু একথা সত্য যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দান-ধ্যানের প্রতি তাঁর সদর্থক ভূমিকা ছিল। তাঁর জমিদারির এক-চতুর্থাংশ ভূমিই ছিল নিষ্কর অর্থাৎ নিজের আত্মীয় পরিজন, প্রিয় ভৃত্য, মন্দির বা বিগ্রহ, বিদ্বান পণ্ডিত কিংবা শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য অপরিমিত দান করতেন। তাঁর সময় প্রচলিত প্রবাদ ছিল যে ব্রাহ্মণের নিষ্কর জমিতে বাস নয় তিনি ব্রাহ্মণই নন। (সরকার, ২০১৯, পৃষ্ঠা-৪৩৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের মতে, নদীয়ার শাসকেরা ধর্ম বিষয়ে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ এবং কুশদ্বীপ এই চারটি সমাজের সমাজপতি আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় শাক্ত ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীও আনুগত্য দেখেছিলেন। তাঁর প্রচ্ছন্য মদতে নবদ্বীপের বৈষ্ণবীয় রাসের মধ্যে শাক্ত রাসের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সূত্রপাত ও তাঁর হাত ধরেই সংঘটিত হয়েছিল। হুতোম প্যাঁচার নক্শার লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ উল্লেখ করেছেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই বাংলায় দূর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বেড়েছিল। (সিংহ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা-১১৩) ধর্ম এবং সাংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজবল্লভী দেবীর পূজার প্রচলন করেছিলেন এছাড়াও তিনি অন্নপূর্ণা পুজো প্রবর্তন করেছিলেন বলে কথিত আছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষ্ণচন্দ্র রায় বহু পূজো পার্বণ এবং মেলার প্রবর্তনের সঙ্গে তাঁর যোগসুত্র রয়েছে বলে পন্ডিত এর অভিমত। এই সূত্র ধরে আমরা বলতেই পারি এই স্বতন্ত্র এবং বিরল এই মেলান সূত্রপাত কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরেই কৃষ্ণনগরে সূত্রপাত ঘটেছিলো।

কৃষ্ণনগর বারোদোল মেলা প্রাঙ্গনের চিত্র তথ্য সংগ্রহ, ১লা এপ্রিল ২০২৩, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

তবে এই মেলার সূত্রপাত যার হাত ধরেই ঘটে থাকুক না কেনা ঐতিহ্যমন্ডিত বারোদোলের মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে উৎসাহের কোনো খামতি চোখে পরে না। এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর দর্শনার্থীদের মধ্যে ঢল নামে। নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে তো বটেই, বিভিন্ন জেলা থেকেও অগণিত মানুষ ভিড় জমান এই মেলায়। বারোদোলের উৎসবে প্রথম তিনদিন ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে পূজিত দেববিগ্রহের দর্শন করা। কিন্তু তিনদিন পর রাজ গৃহের উন্মুক্ত দরজা বন্দ হয়ে যাবার পর শুধুই অবশিষ্ট থাকে মেলাকে উপভোগ করার জন্য। এই সময় প্রাসাদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে চলতে থাকে বাণিজ্যিক ভাবে অস্থায়ী দোকানপাট থেকে বিকিকিনির আসর। আর্থ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকশো বছরের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে কৃষ্ণনগরের এই বারোদোলের মেলা।
এই মেলার সঙ্গে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করে এমন নয়, সমাজ জীবনের আবেগ ও আনন্দকেও ফুঁটিয়ে তুলতে গুরুপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। নদীয়া তথা বিভিন্ন জেলা থেকে এমনকি বাংলাদেশ থেকেও বিভিন্ন ধরণের দোকানপাট এবং দীর্ঘ একমাস তাদের কর্মব্যস্ততা এই বারোদোলের মেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বারোদোল মেলায় বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বহু বছর ধরে সার্কাস মেলা মাঠে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। বারোদোলের মেলাতে সার্কাসের বিভিন্ন রকমের খেলা প্রদর্শিত হয়ে থাকে এবং মাঠের বেশ প্রশস্ত জায়গা জুড়ে এই প্রদর্শণী চলে। সার্কাসকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালন করতে বিশালাকার তাঁবুর আবরণে মাঠের একটি আংশ মুড়ে ফেলা হয় যাকে বিগ টপ বলে। কালচক্রের প্রবাহে বিনোদনের ক্ষেত্রে বিবিধ বৈচিত্র এবং প্রযুক্তির যাঁতাকলে প্রাচীন

এই সার্কাস শিল্প আবলুপ্তির পথে এবং হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব জৌলুশ, এমনকি বন্যপ্রাণী রক্ষা আইনের কঠোরতার কারণে পূর্বের সার্কাসের মতো হিংশ্র পশুদের এখনকার সার্কাসে দেখতে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সার্কাস ফেডারেশনের সঙ্গে ভারত সরকারের বন্য প্রাণী সার্কাসে প্রদর্শন কে কেন্দ্র করে দীর্ঘ আইনি লড়াই ও সংঘটিত হয়েছে। ''The government of India issue an ordinance of prohibiting the training and performance of wild animals in Circus. So department of forest and environment started to confiscate the wild animals from circuses. The Circus Owner Federation of India filed a petition in Supreme Court of India to revoke the ordinance. However, the Supreme Court rejected this appeal and ordered to confiscate all wild animals from all circuses in 1997.'' (Champad, 2013, p. 145) এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরের বারোদোলের মেলাতে কিন্তু সার্কাস আসা বন্ধ হয়ে যায় নি এর কারণ হয়ত এই মেলার সঙ্গে সার্কাসের নিবিড় এক অনুরাগে সখ্যতা রয়েছে।

একসময় বারোদোলের মেলাকে কেন্দ্র করে পুতুল নাচের আসর রাজবাড়ীর মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতো। সুপ্রাচীন পুতুল নাচের সূত্রপাত বাংলায় ঠিক কবে থেকে হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও প্রাচীন বহু সাহিত্যে পুতুল নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহুকে নাচায়। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান। (কবিরাজ, ২০. ৮৩) নদীয়ার শাসক নবদ্বীপাধীপতি বাজপেয়ী অগ্নিহোত্রী মহারাজা ধীরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুরের রাজত্বকালে তাঁর রাজসভা কবি সাহিত্যিকদের দ্বারা অলংকৃত থাকতো। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সভাসদ রায়গুণাকর ভারত চন্দ্র রায় তিনি তার অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পুতুলের বিয়া, সোনার পুতুল। (রায়, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১১) বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন পুতুলনাচ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বেণীপুতুলনাচ, (ভট্টাচার্য, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-১৭৭) শতাধিক বছর পূর্বে চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে দোল পূর্ণিমার একমাস পরে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর চকে বারোদোলের মেলায় বেনী পুতুলনাচ দেখানো হতো। এই পুতুল নাচের দল প্রায় এক মাস ধরে কৃষ্ণনগরের বারোদোল মেলায় পুতুল নাচ দেখিয়ে যেত। নদীয়ার চূর্ণী নদীর তীরে আরংঘাটার যুগলকিশোর মন্দিরে (1728 সালে প্রতিষ্ঠিত মন্দির তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়) জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত মেলায় পুতুলনাচ প্রদর্শন করার পর সেই দল যেত নৈহাটির কাঁঠালপাড়াযর রাধাবল্লভের জীউ এর রথের মেলায়। সেখান থেকে পুতুলনাচের দল নবদ্বীপ, শান্তিপুরের রাসের মেলায় পুতুলনাচ প্রদর্শন করতো। এছাড়া সেকালের সেই বেণী পুতুলনাচ নদীয়া রাজের দ্বারা প্রবর্তিত বিভিন্ন মেলায় এবং নদীয়ার বিবিধ মেলায় পুতুলনাচ প্রদর্শিত করা হতো। (রায়, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৮, ১৯)

পুতুলনাচে ব্যবহৃত পুতুল (সৌজন্য ইন্টারনে)

পুতুলনাচ চিরাচরিত বা ঐতিহ্যগত লোকসংস্কৃতির স্মরণাতীত এবং প্রগতিশীল ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। বঙ্গের পুতুলনাচের মধ্যে আলাদা করে নৃত্য প্রাধান্য পেত না ঠিকই কিন্তু বেশকিছু পুতুলের সহযোগে কৃত্রিম যাত্রাঅনুষ্ঠান মানুষকে মনোরঞ্জনের জন্য মঞ্চস্থ করা হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুতুলনাচ গ্রাম বাংলা তথা শহুরে অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুতুলনাচের মতো কৃত্রিম যাত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ সম্মিলিত ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে পুতুলনাচ গ্রামবাংলার জীবনধারা সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলার পুতুলনাচের মধ্যে কাহিনী ব্যাতিত বাদ্য সঙ্গীত কিংবা পদ্যের সহযোগে পালা মঞ্চস্থ করা হতো। মূলত চার প্রকার পুতুলনাচ বঙ্গের গ্রাম-গঞ্জে প্রচলিত ছিল যেমন - তারের পুতুলনাচ, ডঙ্গের পুতুলনাচ, বেণীপুতুলনাচ এবং ছায়া পুতুলনাচ। তবে উপরে উল্লেখিত পুতুলনাচের মধ্যে তিন ধরণের ঐতিহ্যবাহী নাচই মঞ্চস্থ করা হতো। নদীয়ার ছায়া পুতুলনাচ ছিল মূলত পৌরাণিক বা রামায়ন কাহিনী নির্ভর। লাঠি বা ডাণ্ডের পুতুলনাচ নদীয়ায় একসময় সুপরিচিত এবং প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণনগরের বারোদোল মেলায় আহ্লাদে পুতুলনাচ দেখানোর রেওয়াজ ছিল। (রায়, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫, ১৯) নদীয়া জেলার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বগুলা, মুড়াগাছা, মিলননগর, বড়বেরিয়া ইত্যাদি এছাড়া উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর, তেহট্ট এই সমস্ত পল্লী অঞ্চল ছিল পুতুল নাচিয়েদের বাসস্থান। অন্যদিকে পুতুলনাচ শিল্পী এবং এই শিল্পকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিকাংশ মানুষই ছিলেন তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। (মিত্র, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২৬) একসময় বারোদোল মেলার আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দুই ছিল পুতুলনাচ, ফলে পুতুলনাচের আলাদা সুখ্যাতি শ্রেষ্ঠত্বের গরীমায় প্রতিষ্ঠা ছিল। পুতুলনাচ প্রদর্শনের জন্য মেলা কমিটি স্বতন্ত্র জায়গা নির্ধারিত করে রাখতেন। মেলা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে চলত সেজন্য পুতুলনাচকে আরো অধিক আকর্ষণীয় এবং দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদী এবং পৌরাণিক পালা দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে মঞ্চস্থ করা হতো। এই পালা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নটী বিনোদিনী, সাবিত্রী সত্যাবান, সাধক রামপ্রসাদ,বেগম আসমান তারা, কপালকুণ্ডলা, বাবা তারকনাথ, ভক্ত প্রহ্লাদ, লায়লা-মজনু, সোনাই দীঘি প্রভৃতি। অভিনয়ের মধ্যে সাযুজ্য রেখে গাওয়া হতো বাউল, পল্লীগীতি, কীর্তন, বৈঠকী, ফিল্মি গানের সুর অনুসরণ করে এই গান পরিবেশন করা হতো। (মিত্র, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ৩২, ৩৩)

George Speaight তাঁর পুতুলনাচ নিয়ে বিখ্যাত The History of the English Puppet Theater গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পুতুল থিয়েটার শুধুমাত্র শিশুদের উদ্দেশ্যে ছিল না, সর্বসাধারণের থিয়েটারে পরিণত হয়েছিল। এমনকি ধনী এবং আধুনিকরাও পছন্দ করতেন পুতুলনাচ। তবে হালকা মনোযোগ গ্রহণ বা ক্ষণস্থায়ী অভিনয় হিসেবে; তাদের মৌলিক নিবেদন সর্বদা সরল এবং পবিত্র হৃদয় থেকে কৃষক-শ্রমিক, শিল্পী, কবি প্রভৃতি মানুষদেরনিকট থেকে শিশুসুলভ চেতনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। ফলে পুতুলনাচের মাধ্যমে রোমান্টিক এবং অভিনযব পুতুল থিয়েটার ছিল; তারা সেটি গঠন করেননি কিন্তু সেটি প্রতিফলিত হয়েছিল। (Speaight, 1853, p-11) আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে

বাংলার পূজো-পার্বণ কিংবা বিবিধ মেলাতে পুতুলনাচ আর অনুষ্ঠিত হয় না। প্রাচীন এই পুতুলনাচের সংস্কৃতির ধারা প্রায় অচল এবং অবলুপ্ত। ফলে এই পেশার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষজন বর্তমানে একপ্রকার পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। নদীয়ার বারোদোল মেলায় পুতুলনাচ সর্বশেষ কবে পালা মঞ্চস্থ করেছিল সে সর্ম্পকে স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে ২০০০ সালের ভয়নক প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা) পর ২০০০ সালে সর্বশেষ পুতুলনাচ তাদের আসর রাজবাড়ীর মূল সদর দরজার বামদিকে প্রকান্ড এক বকুল ফুল গাছের পাসেই বসিয়েছিলো। সেজন্য এই ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ বর্তমান নবীন প্রজন্ম প্রায় ভুলতে বসেছে, একসময় পুতুলনাচের পুতুল গুলির অঙ্গসজ্জায় যে মাধুর্য, অপরূপ সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিবোধের জাদুতে আপামর জনসাধারণ বিমোহিত ও মন্ত্র মুগ্ধ ছিল এবং বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষায় যত্নশীল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নাগরদোলা, কাঠের ঘোড়া বা গাড়ি সমন্বিত ঘূর্ণমান চরকা যেগুলো বাংলা ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নাগরদোলা ছাড়া যেকোনো মেলাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বারোদোলের মেলায় নাগরদোলায় চড়েন বিভিন্ন বয়সী মানুষ, এবং আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। একসময় নাগরদোলা তৈরি হতো শক্ত কাঠ দিয়ে তাতে দুটি শক্তিশালী খুটির উপর চারটি কাঠের পাখা থাকতো। সেই ডানার আগার চারটি আসন সংযুক্ত করা থাকতো। সেগুলো যাতে যথাযথভাবে ঘুরতে পারে সেজন্য বিয়ারিং যুক্ত করা হতো তাতে। প্রতিটি আসনে যাতে আরোহীরা বসার পর পড়ে না যায় সেজন্য সিটবেল্ট লাগানো থাকতো। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রঙে ও কারুকার্যে সজ্জিত করা হয়ে থাকে নাগরদোলা। প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতীক হচ্ছে এই নাগরদোলা। বর্তমানে নাগরদোলার শিল্পের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া প্রবেশ করেছে।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের জন্য জগৎ জোড়া খ্যাতি রয়েছে। কথিত আছে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে এই শিল্পের সূত্রপাত ঘটেছিলো। তাঁর পৃষ্টপোষকতায় বাংলাদেশের নাটোর থেকে মৃৎশিল্পীদের নিয়ে এসেছিলেন এবং মাটির পুতুল নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরে এই সমস্ত মৃৎশিল্পীরা কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। এই শিল্পীদের সৌজন্যেই এই শিল্প ব্যাপকতা লাভ করে এবং ক্রমেই তা বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বংশের উত্তর-পুরুষেরা কৃষ্ণনগরে বারো মাসে তেরো পার্বণের ঐতিহ্যে নানা দেবীমূর্তি গঠন করতে শুরু করেন। (সেন, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা-৩১৫) বিশেষ করে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর মূর্তি তৈরিতে রাজবংশের ঐতিহ্য এবং মৌলিকতা লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে শিল্পানুরাগী ব্রিটিশরা মৃৎশিল্পকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এইকারণে কৃষ্ণনগর মানেই মাটির পুতুলকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত যত্ন, আবেগর সংমিশ্রণ এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা। কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত ভাষা সাহিত্যিক লেখক বিদ্যুৎ হালদারের লেখা গ্রন্থ বিস্মরণের বিরুদ্ধে উল্লেখ করেছেন, "কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি ছাড়াও বেশ কিছু মৃৎশিল্পের ঘর বা নির্মাণ-ক্ষেত্র রয়েছে। এই সব অঞ্চলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নতুনবাজার-পালপাড়া, ষষ্ঠীতলা ও আনন্দময়ীতলার আশপাশ। ষষ্ঠীতলার পুরোনো নাম কুমোরপাড়া। মৃৎশিল্পের শোরুম অবশ্য ঘূর্ণিতেই আছে। ইদানিং নতুনবাজার- পালপাড়াতেও শোরুম দেখতে পাওয়া যায়। পর্যটকরা বেশিরভাগই এইসব অঞ্চলে যাতায়াত করে। এছাড়াও কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পাড়ায় ঘরে ঘরে এই শিল্পকাজ হয়। যার ঠাঁই মেলে ঘূর্ণি বা রথতলার শোরুমে। মৃৎশিল্পের আঁতুড় ঘর বলতে যা বোঝায় শুধু পর্যটক নয়, স্থানীয় অনেক মানুষই

তার খবর রাখে না। মৃৎশিল্পীদের সকলেই প্রতিমা তৈরি করে না। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি, বিবেকানন্দ, মাদার টেরেসা ইত্যাদি মূর্তি নির্মাণ করে দেশ-বিদেশের সাপ্লাই করে। দেশ-বিদেশের এইসব মূর্তির খুব চাহিদা। কেউ কেউ সারা বছর ধরে ফল, পশুপাখি, হিউম্যান-ফিগার, মেরি, যিশু ইত্যাদি নির্মাণ করে। এগুলোরও চাহিদা রয়েছে দেশ-বিদেশে।" (হালদার, ২০২২, পৃষ্ঠা-৯৬)

এই মেলা যেহেতু দীর্ঘ একমাস ধরে চলতে থাকে সেকারণে মেলা প্রঙ্গনের বিভিন্ন প্রকার দোকানদারদের জন্য সুনির্দিষ্ট অংশে আলাদা আলাদা ভাবে বিভাজিত করে মেলাকে সজ্জিত করা হয়। এই মেলা জমে উঠতে শুরু করে সন্ধের পর থেকে চলে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত। বিশ্বায়নের ঐশ্বর্যের আড়ালে চাপা পরে যায় নি, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বিভিন্ন লোহার তৈরি সামগ্রীর দোকান এখনও মেলায় লক্ষ্য করা যায়, তবে লোহার জিনিস ব্যবহার করা মানুষের পরিমাণ কমছে। বেশ কিছু বছর থেকে মেলার মধ্যে বৈচিত্রগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, বিভিন্ন জেলা শহর এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মেলাপ্রাঙ্গনে প্রচুর পরিমানে দামি এবং সৌখিন আসবারপত্র নিয়ে হাজির হন। এছাড়া পাঁশকুড়ার চপ, জিলিপি, চাইনিজ খাবারের দোকানপাট, পাঁপড়, বাদাম, রকমারি আইসক্রিম সহ খাদ্য সামগ্রী মেলার গরিমাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে থাকে। এছাড়াও সংসারের ছোটখাটো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে পসরা সাজিয়ে হাজির হন ক্ষুদ্র দোকানিরা। শিশু,কিশোরদের আকৃষ্ট করে বাহারি রকমের হাতে এবং মেশিনে তৈরী দেশি-বিদেশী খেলনা সামগ্রী। ফেরিওয়ালারা বাঁশি, বেলুন ও হাতে তৈরী শীতল হাত পাখা বিক্রি করেন অস্থায়ী ভাবে মাটিতে মাদুর পেতে। কৃষ্ণনগরের এই বারোদোল মেলাকে কেন্দ্রকরে বিপুল সংখ্যক জনগনের কর্মসস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাংলা তথা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে দেখা দিয়েছে এই মেলা। বারোদোল মেলাকে কেন্দ্র করে অধুনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটেছে। তাই ছোট কারবারিদের পাশাপাশি বিগবাজার, কলকাতা বাজার, বাংলাদেশ থেকে আগত তাঁতিদের শাড়ির বাজার, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রাংশের বাজার দখল করে থাকে রাজবাড়ীর মেলা প্রাঙ্গন। ফলে বারোদোলের মেলার জৌলুশ বা জাঁকজমকতা, ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব সীমাহীন ভাবে অগ্রগতি ঘটেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘস্থায়ী থাকুক কৃষ্ণনগরের বারোদোলের মেলা বাঙালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, আবেগ, অনুভূতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে।

টীকাটিপ্পনী

[1]. কৃষ্ণনগরের একসময় নাম ছিল রেউই। বাংলার বারোভূঁইয়া জমিদারদের দমনে ভবানন্দ মজুমদার (দুর্গাদাস সমাদ্দার) মুঘল সেনাপতি মানসিংহকে প্রভূত পরিমানে সাহায্যের পরিনাম হিসেবে ১৬০৬ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ভবানন্দ মজুমদারকে এক ফরমান দ্বারা নদীয়ার জমিদারি স্বত্ব প্রদান করেছিলেন। নদীয়ার জমিদার ভবানন্দ মজুমদার বাগোয়ান থেকে রাজধানী মাটিয়ারিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে গোপালের পুত্র রাঘব রায় মাটিয়ারি থেকে রেউই গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। রাঘব রায়ের পুত্র রুদ্র রায় রেউই এর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭২৮-৮২) কৃষ্ণনগর বাংলার সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

[2]. বঙ্গে মেলার সূত্রপাত ঘটেছে প্রধানত গ্রাম্য সংস্কৃতিক ধারা হতেই। কিন্তু কীভাবে এবং কবে থেকে মেলার সৃষ্টি হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা কষ্টকর। ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের ধারণা বাংলায় নানা ধরণের ধর্মসম্বন্ধীয় কৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের সূত্র ধরেই মেলার উৎপত্তি হতে পারে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বঙ্গে মেলার প্রাচীনত্ব হাজার বছরেরও অধিক পুরাতন। এদেশের প্রাচীন পর্যায়ের উৎসব ও কৃত্যানুষ্ঠানকেন্দ্রিক মেলা গুলির মধ্যে প্রথমেই আসে জীবনধারণের আহার্য শস্য এবং বিশেষ করে কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে কেন্দ্র করে। একসময় গ্রাম-গঞ্জের শহরের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে প্রতি বছর জানা-অজানা প্রায় কয়েক হাজারের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে-নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ে বা তিথিলগ্নে এক একটি মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। মেলাতে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নরনারী, শিশু-কিশোর এমনকি আবাল বৃদ্ধরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু মেলার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থের টুকিটাকি পণ্যদ্রব্যের বিপুল সমাবেশ এছাড়াও চিত্তবিনোদনের জন্যে- যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ, নাগরদোলনা, ইত্যাদির আসর।

[3]. অঞ্জনা নদী বর্তমানে আমরা যাকে অঞ্জনা খাল বলে চিনি। কৃষ্ণনগরের কাছে ৫২ নম্বর রুইপুকুর মৌজা থেকে সৃষ্টি হয়ে এই নদী কৃষ্ণনগরের প্রশাসনিক ভবনের পাশ দিয়ে ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে দিয়ে বেজিখালি মোড় হয়ে রাজবাড়ীর পেছন দিয়ে শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল অতিক্রম করে দোগাছির কাছে পৌঁছেছে। সেখানে হাটবোয়ালিয়ার কাছে নদীটি দুটি অংশে বিভাজিত হয়েছে। একটি খণ্ড জালালখালি, জলকর পাটুলি, বাদকুল্লা, চন্দনপুকুর হয়ে ৩৪ নম্বর ব্যাসপুর মৌজার কাছে চূর্ণী নদীতে মিলিত হয়েছে। হেলেরখাল নামে বিদিত অপর খণ্ডটি হাটবোয়ালিয়া থেকে যাত্রাপুর, জয়পুর, গোবিন্দপুর, ইটাবেড়িয়া, হয়ে হাঁসখালির কাছে চূর্ণী নদীতে মিলেছে। একসময় এই নদীকে কেন্দ্র করেই নদীয়ারাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নৌকাপথে নদীর পথ বেয়ে নবদ্বীপ, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, চন্দননগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায়, পূর্বে এই নদী পথেই যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌকো যাতায়াত উপযোগী ছিল। বাদকুল্লা শ্মশানটিও অঞ্জনা নদীর তীরে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া রাঘব রায় দ্বারা নির্মিত দোগাছির অনুপম টেরাকোটা শৈলীতে নির্মিত শিব মন্দিরটিও সম্ভবত এই নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল, যেটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে অবলুপ্ত। জনশ্রুতি অনুযায়ী, কৃষ্ণনগরের রাজা রুদ্র রায়ের সময়কালে (১৬৮৩-১৬৯৪) অঞ্জনার উপর প্রথম আঘাত নেমে এসেছিলো কারণ নদীকে কৃত্রিম ভাবে রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বাধা পেয়েছিলো।

[4]. কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন রঘুরামের পুত্র ১৭১০সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিদ্যান ব্যক্তি আরবীকে, ফার্সী, সংস্কৃত শাস্ত্র এমনকি প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর তাঁর প্রজ্ঞার দ্যুতি ছিল সীমাহীন। ১৭২৮-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নদীয়ার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মতে, তাঁর রাজ্যের সীমানা ছিল "রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীর খাদ।। দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড়গঙ্গা পার।। তাঁর রাজত্ব কালেই নদীয়াতে বারোদোলের সূত্রপাত হয়েছিল বলেই অধিকাংশ পণ্ডিত তথা গবেষক অভিমত অভিব্যক্ত করেছেন।

[5]. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) গীতিকার, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী, গ্রন্থকার। জন্ম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, ১৮২০ সালের অক্টোবর। প্রথমে ফারসি, পরে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে তিনি কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে গৃহশিক্ষক ও সঙ্গীতগুরু হিসেবে নিযুক্ত হন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮২) অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্রের (১৮১৯-১৮৫৭) আমলে রাজবংশের সেক্রেটারি এবং পরে মহারাজার বিশ্বাসভাজন হলে 'দেওয়ান' বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার পদ লাভ করেন।

[7]. উলা নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রাচীন, সুপ্রসিদ্ধ এবং বর্ধিষ্ণু এক গ্রামের নাম। ধারণা করা হয়ে থাকে উলু বনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ থেকেই এই স্থানের নাম হয়েছে 'উলা'। ফারসি শব্দ 'আউল' বা 'জ্ঞানী' থেকেই সম্ভবত এই স্থানের নামকরণ হয়েছে উলা। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রণীত চণ্ডী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে উক্ত সময়ে শ্রীমন্ত সদাগর পিতৃ উদ্দেশ্যে সিংহল আধুনা শ্রীলঙ্কা যাবার পথে তিনি উলার নীচে নিজ জাহাজ নঙ্গর করে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সুপ্রসিদ্ধ উলাইচন্ডীদেবীর পূজা দিয়েছিলেন। উলার জনসাধারণের ধারণা তাদের রক্ষাকারিণী দেবী হলেন দেবী উলাই চণ্ডী। বুদ্ধ পূর্ণিমার তিথিতে দেবী উলাই চণ্ডীর বার্ষিক পূজা নিষ্ঠা ও ঐতিহ্য মেনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই পুজো। ব্রিটিশ আমলে ডাকাত বা দস্যুদের দমনে উলার জনগণের বীরত্ব দেখে আদালতের অভিপ্রায়ানুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই গ্রামের নাম উলার পরিবর্তে রাখেন 'বীরনগর' অর্থাৎ 'বীরদের নগরী'।

তথ্যসূত্র

১. মল্লিক, কুমুদনাথ (১৯৮৬), *নদীয়া-কাহিনী,* (মোহিত রায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২. Garret, J. H. E. (1910), *Bengal District Gazetteers, Nadia,* Bengal Secretariat Book Deport, Calcutta

৩. মিত্র, অশোক (১৯৬৮), *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা,* (সম্পদনা), দ্বিতীয় খন্ড, অনু প্রেস, দিল্লী

৪. মল্লিক, কুমুদনাথ (১৯৮৬), *নদীয়া-কাহিনী,* (মোহিত রায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫. দাস, হরিদাস (২০১৪), *শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, এবং সরকার, শৈবাল (২০১৯), *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও সমকাল,* (সম্পাদনা), মুদ্রা

৬. চক্রবর্তী, অলোক কুমার(২০২১), *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* কে. মিত্র, কলকাতা

৭. সরকার, শৈবাল (২০১৯), *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও সমকাল,* (সম্পাদনা), মুদ্রা

৮. রায়, রজতকান্ত (২০০৮), *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৯. রায়, রজতকান্ত (২০০৮), *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

১০. মল্লিক, কুমুদনাথ (১৯৮৬), *নদীয়া-কাহিনী,* (মোহিত রায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১১. মল্লিক, কুমুদনাথ (১৯৮৬), *নদীয়া-কাহিনী,* (মোহিত রায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১২. Ward, William (1815), *A view of the History, Literature and Religion of Hindoos*, Vol-2, Serampore

১৩. Ward, William (1815), *A view of the History, Literature and Religion of Hindoos*, Vol-2, Serampore
১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন, 31শে মার্চ, 2019
১৫. সরকার, শৈবাল (২০১৯), *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও সমকাল*, (সম্পাদনা), মুদ্রা
১৬. *ঋগ্বেদ*, ১০. ১১৭. ৬
১৭. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৭. ২০
১৮. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৭. ২১
১৯. সরকার, শৈবাল (২০১৯), *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও সমকাল*, (সম্পাদনা), মুদ্রা
২০. সিংহ, কালীপ্রসন্ন (১৯৫৬), *হুতোম প্যাঁচার নক্শা* (সম্পাদনা), বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

২১. Champad, Sreedharan *(2013), All Album of Indian Big Tops*, Strategic Book Publishing, Delhi
২২. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস *চৈতন্যচরিতামৃত*, ২০. ৮৩
২৩. রায়, মোহিত (১৯৯৫), *নদীয়ার পুতুলনাচ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
২৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৫৪), *বাংলার লোকসাহিত্য* (তৃতীয় খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা
২৫. রায়, মোহিত (১৯৯৫), *নদীয়ার পুতুল নাচ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
২৬. রায়, মোহিত (১৯৯৫), *নদীয়ার পুতুল নাচ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
২৭. মিত্র, সনৎ কুমার (১৯৮৯), *পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা
২৮. মিত্র, সনৎ কুমার (১৯৮৯), *পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা
২৯. Speaight, George (1853), *The History of the English Puppet Theater*, John De Graff, New York,
৩০. সেন, দীনেশচন্দ্র (১৯৪৯), *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা
৩১. হালদার, বিদ্যুৎ (২০২২), *বিস্মরণের বিরুদ্ধে,* মুদ্রা প্রকাশনা